দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 14 OCT 1987
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

7

মঞ্চ-ময়দানে

পথিক

বই-পুস্তক নিয়ে ডাকাতি (বা Book Piracy)-এর উপর সুপণ্ডিত ডঃ মীজানুর রহমান শেলীর লেখা একটা প্রবন্ধ পড়েছিলাম বেশ কিছুদিন আগে। বই-পুস্তকের "কপিরাইট" বা গ্রন্থসত্ত্ব নিয়ে কিংবা বইয়ের ব্যবসায় নিয়ে যে দস্যুবৃত্তি চলে ডঃ শেলী সে. কথাই বিষদ আলোচনা করেছিলেন তাঁর লেখায়। কিন্তু হায়, সীমিত বুদ্ধিবৃত্তির এই দেশে কাগজের লেখালেখির আবেদন বড়জোর ২৪ ঘন্টা স্থায়ী হয়। তাও আবার পাঠকের সংখ্যা ০·৫ শতাংশ হবে কি-না সন্দেহ। এর মধ্যেও বোধ করি টেণ্ডার-বিজ্ঞপ্তি ও সিনেমার খবর পড়ার পাঠক শতকরা ৮০ থেকে ৯০ ভাগ। গণ-মাধ্যমের প্রচার-কার্যক্রমের এই করুণ অবস্থায় দেশ হিতৈষী কথাবার্তা জনগণের কর্ণকুহরে প্রবেশের সুযোগই পায় না। সেই দেশে বিদেশী গ্রন্থ-প্রকাশক ও ব্যবসায়ীরা সীমিত যেটুকু বাজার পেয়েছে, সেটুকুতেই তাদের একচ্ছত্র বা একচেটিয়া দখল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ডাক্তারী বই, ইঞ্জিনিয়ারিং বই, ড্রইং-স্কেচ-নক্শার বই, বিবিধ ইঞ্জিনিয়ারিং ও টেকনোলজীর বই-পুস্তক তো অবাধে এদেশে আসছেই। সেই সাথে আসছে বিনোদনের বই, আসছে এদেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্য বিকৃতিকারী বই। আসছে ম্যাগাজিনের পর ম্যাগাজিন। ১৯৭১ সালে এদেশে এতবড় বাজার দখল করে যদি অন্য কোনো ভারতীয় পণ্য সুবিধা করতে নাও পারে, তবুও বলতে হবে বই-পুস্তকের বাজার হিসেবে বাংলাদেশ ভারতীয় পুঁজি ও প্রতিভার দ্বিবিধ সাফল্য নিশ্চিত করছে। একটি হলো একতরফা বাণিজ্যিক মুনাফা— অন্যটি হলো এদেশে বই-পুস্তক-ম্যাগাজিনের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক অন্তর্ঘাত বা (Cultural subversion) পরিচালনা করা।

বই-পুস্তকের ব্যাপারে, বিশেষ করে পাঠ্য বইপত্রের ব্যাপারে বেশী কথা বলার নেই। আজকাল অধিকাংশ পাশ্চাত্য প্রকাশনী সংস্থাই ভারতের খ্যাতনামা প্রকাশনী সংস্থার সাথে যৌথ ব্যবস্থাপনায় বই বাজারজাত, এমনকি প্রকাশনাও করছে। দ্বিতীয়তঃ ভারতীয় বই বিদেশের অন্য যে কোনো বইয়ের চেয়ে দামে সস্তা এবং ছাপায় ভাল। বিভিন্ন একাডেমিক এবং ব্যবহারিক বিষয়ের উপর ভারতীয় গ্রন্থ এবং জার্নাল উন্নতমানের এবং গ্রন্থের ভিতরের সম্পদটুকু তার প্রচ্ছদ মূল্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ— এ কথাও সত্য। কিন্তু বাণিজ্য এখন যে অবস্থায় চলছে তাকে বৃটেনের শিল্প-বিপ্লব পরবর্তী ভারতীয় উপনিবেশে ল্যাংকাশায়ারের কলের কাপড়ের একচেটিয়া বাজারের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। বাংলাদেশে অন্য যে কোনো শিল্পক্ষেত্রের তুলনায় প্রকাশনা শিল্পটি পিছিয়ে রয়েছে। একদিকে মৌলিক গ্রন্থাবলীর অভাব, অন্যদিকে গ্রন্থের গগনচুম্বী দামের ফলে বাংলাদেশের প্রকাশনা শিল্প মোটেও আভ্যন্তরীণ বাজার করতে পারেনি। ছাপার সামগ্রী কালি, কাগজ, নিউজপ্রিন্টের দাম দরে সরকার ভর্তুকিরও কোনো বালাই নেই। (ভারতে যা আছে)। এখন পর্যন্ত কোনো বড় প্রকাশনী সিণ্ডিকেটও গড়ে ওঠেনি। যে গুটিকতেক শিল্প গড়ে উঠেছে, তাদের প্রকাশনা শিল্পের নীতি-আদর্শ নিয়েও ঘোরতর আপত্তি আছে অনেকের। ভারতঘেঁষা মন-মানসিকতা নিয়ে প্রকাশনা শিল্পে অনেকেই বেশ জাঁকিয়ে বসেছেন। এতে বরং ভারতীয় প্রকাশনা বাজার সম্প্রসারণ প্রক্রিয়া ষোলকলায় পূর্ণ হয়েছে। সমাজ বিজ্ঞান ও রাষ্ট্র বিজ্ঞানের ছাত্রদেরকে বিনয় ঘোষ, গোপাল হালদার, রোমেলা থাপার, রাহুল সাংকৃত্যায়ন, ক্ষিতিমোহন সেন, দীনেশ চন্দ্র সেন, নীরোদ চৌধুরী প্রমুখের লেখা না পড়লেই নয়। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, ঢাকার বইয়ের দোকানে বংকীম বা শরৎ রচনাবলী ফুল ভলিউম থাকতেই হবে। ঢাকার বইপাড়ায় ইসমাইল হোসেন সিরাজী আজ প্রায় অনুপস্থিত। কাজী ইমদাদুল হক, নজিবুর রহমান, একরামউদ্দীন, শাহাদৎ হোসেন, গোলাম মোস্তফা, আকবরউদ্দীন, আবুল মনসুর আহমদ, আবুল ফজলের মতো কথাসাহিত্যিক আজ নির্বাসিত। এমন অনেক প্রকাশকও আছেন, যারা আবু রুশদ্ মতিনউদ্দীন, সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ, কাজী আফসার উদ্দীনের নাম খুব সামান্যই শুনেছেন। আলাউদ্দীন আল আজাদের মতো জনপ্রিয় প্রতিভাকে পাশ কাটিয়ে আমরা বিমল, শীর্ষেন্দু, সুনীল, শংকর করতে করতে মুখে গ্যাঁজা তুলে দেই, জাতে ওঠার কোশেস্ করি! কি জানি, জাতে ওঠা বলতে আমাদের প্রগতিশীল ভাবুকরা কি বোঝেন?

মীর মোশাররফ হোসেন 'জমিদার দর্পণ' নাকট লিখে ইতিহাস হয়ে আছেন। কিন্তু সেই মীর মোশাররফ, মোহাম্মদ আবদুল করিম, ইব্রাহীম খাঁ, আবুল ফজল, নূরুল মোমেন, শাহাদাৎ হোসেন, আ, ন, ম, বজলুর রশীদ, অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী, জহীর রায়হান প্রমুখ কীর্তিমান নাট্যকার থাকা সত্ত্বেও আমাদের তরুণ সংস্কৃতিসেবীরা যখন নাটকের আকাল অনুভব করেন এ দেশে, তখন বিস্ময় লাগে। এ দেশের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক পটভূমিতে দাঁড়িয়ে যারা "জাতে ওঠার জন্য" একদা বিলেতমুখী হয়ে থাকতেন, পিণ্ডি-পেশোয়ার-করাচী অভিমুখে হিজরত করতেন, ঠিক সেই একই সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরজীবী শ্রেণীটি আজ ভারতের সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের বরকন্দাজগিরি করছে। ভারতের সাংস্কৃতির উজ্জ্বল দিকগুলো আলো বিকিরণ করতে করতে এ দেশে এসে পৌঁছুতে পারবে না তা বলছি না।

পাকিস্তান আমলে সাংস্কৃতিক পরিশুদ্ধির মাধ্যমে ইসলামী তামুদ্দুন প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে এ দেশের সহজাত সাংস্কৃতিক বিকাশকে যেভাবে দাবিয়ে রাখা হয়েছিলো, আজ পুরোপুরি ভারতীয় কৃষ্টির প্রতি আনুগত্যের পরম পরাকাষ্ঠা দেখাতে গিয়ে পুনরায় আমরা বিপথগামী করে তুলছি আমাদের প্রকৃত সাংস্কৃতিক সত্ত্বাকে। এই প্রক্রিয়ায় ভারতীয় বইপত্রের অবাধ বাজার আমাদের নিজস্ব শিক্ষা-সংস্কৃতি-শিল্প ও যাবতীয় নান্দনিক কলাকে করে তুলছে একপেশে, এক দেশদর্শী।

বই-পুস্তকের কথা বলতে বলতে অন্য প্রসঙ্গে চলে গেলাম। আমাদের দেশে এমন অজস্র ভারতীয় গ্রন্থ আসছে যা পাঠ করে আমাদের কিশোর-যুবকরা এমনকি বড়রাও বিভ্রান্ত হতে বাধ্য। একটা বইয়ের কথা বলি। তুষার কান্তি পাণ্ডে সম্পাদিত "হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ সাধক" বইটি সেদিন এক লাইব্রেরীর র‍্যাক থেকে নামিয়ে নেড়ে চেড়ে দেখছিলাম। তাতে সারা বিশ্বের প্রায় অর্ধশত সাধক মহাপ্রাণ ত্যাগী ব্যক্তিত্বের নাম ও কীর্তিগাঁথা বর্ণনা করা হয়েছে। বিশ্ব ইতিহাসে কোনো মুসলমান সাধু, দরবেশ, সাধকের আগমন ঘটেনি— অন্ততঃ এ বইটা পড়ে তাই মনে হবে। এখানে ঠাঁই পেয়েছেন একমাত্র সম্রাট আকবর। তাও সম্ভবতঃ তার সেই দ্বীন-ই-ইলাহী নামক হিন্দু-মুসলমান সাংস্কৃতিক সম্মিলনী উদ্যোগের জন্য। এই গ্রন্থনায় শংকরাচর্য, রামানুজ, তিরুপান্ন, রবিদাস, মহাস্থবির, বালানন্দ ব্রহ্মা, দূর্গাপ্রসন্ন পরমাহংস থেকে শুরু করে বুদ্ধদেব, অতীশ দ্বীপঙ্কর, দয়ানন্দ সরস্বতী, নিম্বার্ক, শ্রী শ্রী সীতারাম প্রমুখ সবার কথা বলা হয়েছে। সাধু দরবেশদের দীর্ঘ তালিকা থেকে মার্টিন লুথার, সেন্ট পীটার, সেন্ট পল, সেন্ট টমাস, এ্যাকুইনো, গুরু নানক, ঋষি অরবিন্দ, শিন্টো, কনফুসিয়াস কেউই বাদ যাননি। বাদ গেছেন শুধু মুসলমান সাধু, সাধক-দরবেশগণ। কারণ তাঁরা মুসলমান।

বুক শেল্ফ ঘাঁটতে ঘাঁটতে আর একটা বড় বই পেলাম। এটি হলো ভারতীয় লীলা-আদিরস ভরা "কামসূত্র।" আধুনিক গ্রন্থরূপে এই "কামসূত্র বাৎস্যায়নের" সম্পাদনা করেছেন শ্রীদেবকুমার বসু। বইটা ছেপে বাজারে ছেড়েছে কোলকাতার মৌসুমী প্রকাশনী। কামসূত্র ভারতীয় হিন্দু পৌরাণিক দেব-লীলা-যজ্ঞ বলে এতকাল যে ধারণা ছিলো তা ভ্রান্ত মনে হলো মৌসুমী প্রকাশনীর "কামসূত্র" বইটি দেখে। এতে বিভিন্ন আসনে রতিক্রিয়ারত দেব-দেবীর প্রস্তরমূর্তির ছবির ফাঁকে ফাঁকে কিছু ইলাস্ট্রেশন (অংকিত ছবি) ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে। এসব ছবিতে দেখা যাচ্ছে ভারতের মুসলমান রাজা-রাজাড়ারা (মাথায় রাজকীয় টুপি আর মুখে দাড়ি নিয়েই) রমুণী সম্ভোগে লিপ্ত হয়েছে। তাদের নিম্নাঙ্গ সম্পূর্ণ বিবস্ত্র এবং পুরুষদের তুলনায় নারীদেরকে দেখানো হয়েছে শিশু আকৃতির। এতে বোধ করি শিশু বলৎকারের ধারণাও আসতে পারে।

প্রকৃত কামসূত্রের ব্যাখ্যা, চিত্র এবং রমণ পদ্ধতির আদিরস হিন্দু সভ্যতার এক অবিচ্ছেদ্য সাংস্কৃতিক পরিচয় বহন করে আসছে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে। কিন্তু মুসলমানরা তো কোনোদিনই রমণপদ্ধতি নিয়ে প্রকাশ্য চর্চা বা শৈল্পিক আঁকিবুকি অনুসরণ করেনি। বিশেষ করে মুসলমান রাজা-বাদশাহদের এহেন প্রকাশ্য লাম্পট্য বা যৌন-যথেচ্ছাচারের কোনো ঐতিহাসিক ভিত্তি বা নমুনা-নিশানা আছে বলেও তো কখনো শুনিনি। "কামসূত্রেই" প্রথম দেখলাম হিন্দু মূর্তির মতো মুসলমান রাজা-বাদশাহরা হেরেমে পশুর মতো প্রকাশ্য নারী সম্ভোগে লিপ্ত! এর অর্থ কিন্তু এই নয় যে, আমি বলতে চাই মুসলমানরা ওকম্ম করে না। আলবত করে। প্রতিটি প্রাণীর সহজাত নিয়মেই করে। কিন্তু "কামসূত্রে" পৌত্তলিক যৌনাচারের যথেচ্ছ আচরণে মুসলমান শাসকদের এভাবে চিত্রিত করাটা কি আদৌ সত্যনিষ্ঠ হয়েছে? চরিত্র হননের এহেন শিল্পিত প্রয়াসের কি সত্যিই খুব বেশী প্রয়োজন ছিলো?